শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

নারায়ণের সহস্রনাম উচ্চারণের প্রারম্ভ বা মুখবন্ধের অন্তিম শ্লোকেই পিতামহ ভীষ্ম সচেতন করে দিচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে 'যানি নামানি গৌণানি' বলে—অর্থাৎ এইসমস্ত নাম গুণাত্মক (ত্রিগুণাত্মক) কারণ সমস্ত নামরূপের পারে যিনি, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—যেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে মন-বাণী ফিরে আসে, সেই অধরাকে নামের বন্ধনে বাঁধা যায় না। তবুও তিনি নেমে আসেন মায়ার সীমানায়—জন্মরহিত অবিনশ্বর হয়েও। মায়াধীশ হয়েও যোগমায়াকে আশ্রয় করে তিনি আবির্ভূত হন—''অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।/ প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥'' (গীতা, ৪।৬)

তখন একমাত্র ঋষিরাই তাঁকে বুঝতে পারেন, তাঁরাই পরম আবেগে সেই নামরূপাতীতকে নামের বন্ধনে ভূষিত করেন—'ঋষিভিঃ পরিগীতানি'। নিত্যকে লীলার মাধুর্যে মধুময় করার প্রচেষ্টাই ভক্তমনের ভালোবাসা। এই রসের রসিক সকলে হতে পারে না, এই আস্বাদন সকলের জন্য নয়, গীতাতে ভগবান একথাও বলে গেছেন—অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ (৭।২৪)।

কলিসন্তরণ উপনিষদে পাই, ভক্ত নারদকে ব্রহ্মা বলছেন, ''সর্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্তং তৎ শৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যতি ভগবতঃ আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি'' (১)—নারায়ণের নামজপ কলিসংসার-সাগর থেকে ত্রাণ করে, এ শ্রুতিসিদ্ধান্ত, এ এক গুপ্তরহস্য।

শাংকরভাষ্য : অত্র নামসহস্রে আদিত্যাদিশব্দানাম্ অর্থান্তরে প্রসিদ্ধানামাদিত্যাদ্যর্থানাং তদ্বিভূতিত্বেন তদভেদাৎ তস্যৈব স্তুতিরিতি প্রসিদ্ধার্থগ্রহণেঽপি তৎস্তুতিত্বম্।

ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৮।৫০)

জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুর্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।/ নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্বং যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য॥ (তদেব, ২।১২।৩৮)ইতি বিষ্ণুপুরাণে।

'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ' (১০।২১) ইত্যারভ্য 'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥' (১০।৪২) ইতিপর্যন্তং গীতায়াম্। 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্' (মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২।১১) 'পুরুষ এবেদং বিশ্বম্' (তদেব, ২।১।১০) ইতি শ্রুতিশ্চ। বিষ্ণ্বাদিশব্দানাং পুনরুক্তানামপি বৃত্তিভেদেনার্থভেদান্ন পৌনরুক্ত্যম্। শ্রীপতির্মাধব

ইত্যাদীনাং বৃত্ত্যেকত্বেঽপি শব্দভেদান্ন পৌনরুক্ত্যম্। অর্থৈকত্বেঽপি ন পৌনরুক্ত্যং দোষায়, নাম্নাং সহস্রস্য কিমেকং দৈবতমিতি পৃষ্টেরেকদৈবত-বিষয়ত্বাৎ। যত্র পুঁল্লিঙ্গশব্দপ্রয়োগস্তত্র বিষ্ণুর্বিশেষ্যঃ; যত্র স্ত্রীলিঙ্গশব্দস্তত্র দেবতা বিশেষ্যতে যত্র নপুংসকলিঙ্গশব্দস্তত্র ব্রহ্মেতি বিশেষ্যতে। 'যতঃ সর্বাণি ভূতানি' (বিষ্ণুসহস্রনাম ১১) ইত্যারভ্য জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণস্য ব্রহ্মণ একদৈবতত্বেন অভিহিতত্বাদাদাবুভয়বিধং ব্রহ্ম বিশ্বশব্দেনোচ্যতে।

ভাবানুবাদ : বিষ্ণুসহস্রনামের অবতরণভাষ্যে ভাষ্যকার 'বিষ্ণু' নামের ব্যাপ্তির সূত্র নিয়ে গেছেন আদিত্যে। আদিত্য আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, সূর্য-উপাসনাই আমাদের প্রারম্ভিক উপাসনা—সূর্যার্ঘ্য দিয়েই আমরা আমাদের সমস্ত দেবার্চনা বা পূজাদি শুরু করি। ভাষ্যকার বলছেন, বিষ্ণু-সহস্রনামের উচ্চারণে যেখানে 'আদিত্য' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, সেখানে আদিত্য শব্দের লক্ষণ (বাচ্যার্থ) যদি সূর্যও করা হয়, তাতেও কোনও ভুল নেই, কারণ ভগবান নিজেই গীতায় (১৫।১২) বলেছেন, ''যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তে-ঽখিলম্।/ যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥'' অর্থাৎ আদিত্য শ্রীবিষ্ণুর বিভূতি হওয়ায় বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন। তাই প্রসিদ্ধ অর্থে বা প্রচলিত অর্থে আদিত্য শব্দের অর্থ দিবাকর সূর্যরূপে গ্রহণ করলেও ভগবান বিষ্ণুর স্তুতিই সেক্ষেত্রে হচ্ছে।

আচার্য শংকর 'বিষ্ণু'র ব্যাপ্তি এনেছেন সর্বত্র, বিষ্ণুপুরাণের উদ্ধৃতি এনে বলছেন, ''ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রধানাত্মা, আত্মা (জীবাত্মা) এবং পরমাত্মা সবই তিনি। তিনি এই উপাধিপঞ্চকে স্থিত'' (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৮।৫০)। নক্ষত্রগণ বিষ্ণু, সমগ্র ভুবন বিষ্ণু, তথা বন, পর্বত, দশদিক সবই বিষ্ণুময়। নদী, সমুদ্র যা-কিছু এই পৃথিবীতে সত্তাবান তা-ই বিষ্ণু—যা আছে (অস্তিত্ববান) তা সবই বিষ্ণু, এমনকী যা নেই তাও বিষ্ণু (বিষ্ণুপুরাণ, ২।১২।৩৮)। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান 'আদিত্যানামহং বিষ্ণু'—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু এইভাবে প্রারম্ভ করে, অন্তিম শ্লোকে বলছেন, ''হে অর্জুন, আমার বিষয়ে বহুজ্ঞানে তোমার কী প্রয়োজন? জেনে রাখো, আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একার একাংশে ধরে স্থিত, অর্থাৎ আমি ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই।'' মুণ্ডক উপনিষদ বলছেন, 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্'—এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান, ব্রহ্ম জগতের সর্বত্র প্রসৃত, ব্যাপ্ত—তাই বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ (২।২।১১)। এই জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, তাই ব্রহ্মের বোধ হলে জগতের বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। মুণ্ডক উপনিষদ সেই অক্ষর পুরুষকে বলছেন জ্যোতির্ময় (২।১।২)। তাঁর থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি—'এতস্মাৎ জায়তে'। সমগ্র বিশ্বে তিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন বলে এই জগৎ তাঁরই প্রকাশ, জগতে তিনিই একমাত্র প্রকাশিত (মুণ্ডক, ২।১।১০)।

বিষ্ণু শব্দের সহস্র উচ্চারণকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখলে পুনরুক্তি দৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার বলছেন, এই পুনরুক্তিকে দোষ বলা যাবে না। বৃত্তিভেদ অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক ভিন্নতা বা অর্থভেদ থাকায় পুনরুক্তি বলা যাবে না। আবার কোথাও কোথাও অর্থ এক যেমন শ্রীপতি—মাধব, পুষ্করাক্ষ—কমলাক্ষ ইত্যাদি, কিন্তু শব্দের উচ্চারণে ভিন্নতা থাকায় পুনরুক্তি দোষ বলা যাবে না। আর গভীর অর্থে সমস্ত নামের উচ্চারণ সেই একই দেবতাকে কেন্দ্র করেই, সমস্ত নামের লাক্ষণিক বৃত্তি তো ভগবান বিষ্ণু, তাই পুনরাবৃত্তি এখানে স্তুতির ঐশ্বর্য। ফলে দোষের নয়, গৌরবের।

সহস্রনামের উচ্চারণে এই বিষ্ণু শব্দে কোথাও পুংলিঙ্গ, কোথাও স্ত্রীলিঙ্গ, কোথাও বা নপুংসক লিঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে। ভাষ্যকার বলছেন, যেখানে পুংলিঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে সেখানে বিষ্ণু শব্দের অর্থ

সগুণ ব্রহ্ম লক্ষ্মীপতি নারায়ণ হবে। স্ত্রীলিঙ্গের প্রয়োগস্থলে তিনি 'শক্তি' রূপে প্রকাশিত এবং যখন নপুংসক লিঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে তখন তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ্ শব্দ) এমন বুঝতে হবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা এই বিষ্ণুসহস্রনাম পারায়ণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। সনাতন গোস্বামী 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে নারায়ণপূজার অঙ্গ হিসেবে সহস্রনাম পাঠকে নির্দেশ করেছেন। গৌরাঙ্গপার্ষদ গোপালভট্ট গোস্বামী (বৃন্দাবনের রাধারমণের উপাসক) তাঁর বৈষ্ণবাচার গ্রন্থ 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'তে বিষ্ণুসহস্রনামের ব্যাখ্যায় শাংকরভাষ্যকেই অনুসরণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদেরাও এই বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। ধীরেশানন্দজী তাঁর 'রত্নমঞ্জুষা' গ্রন্থে লিখেছেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী নিত্য বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ না করে জলস্পর্শ করতেন না। যতীশ্বরানন্দজী যখন মাদ্রাজ মঠে ব্রহ্মচারী তখন ব্রহ্মানন্দজী তাঁকে প্রত্যহ বিষ্ণুসহস্রনাম আবৃত্তি করতে বলেছিলেন। স্বামীজীও পছন্দ করতেন এই বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ। স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিচারণে পাই, ''আমরা একত্রে ঋষিকেশে রয়েছি... প্রত্যহই একজন পশ্চিমদেশীয় সাধু ঐখানে বসে গীতা পাঠ করতেন। তাঁর লেখাপড়া বিশেষ জানা ছিল না। পাঠে প্রায়ই ভুল হত। 'গুড়াকেশেন' শব্দটি তিনি 'গুড্ডাকেশেন' বারংবার উচ্চারণ করছেন শুনে স্বামীজী পরমযত্ন ও বিশেষ দরদের সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন। আমাদের বললেন, 'তোমরা রোজই এই ভুল পড়া শোন, আর শুধরে দাও না? তোমাদের সাধুর ওপর এতটুকু সমবেদনা নেই?' শেষে স্বামীজী তাঁকে আরও বললেন, 'মহারাজ, আপনি গীতার চেয়ে সহজ বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করলে অনায়াসেই শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবেন। আর ভগবানের নামোচ্চারণে আনন্দ-ও পাবেন।' ''

'যতঃ সর্বাণি ভূতানি' থেকে (শ্লোক ১১-১৩) আরম্ভ করে জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণরূপী ব্রহ্মকেই একমাত্র দেবতারূপে (কিম্ একম্ দৈবতম্ লোকে..., শ্লোক ২) অভিহিত বা কথিত হয়েছে, তাই সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ভাবেই সেই ব্রহ্মকে সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করা হচ্ছে 'বিশ্ব' শব্দের মাধ্যমে।

আমরা যদি 'শ্রীমদ্ভাগবত' বা 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থের দিকে দৃষ্টি রাখি, দেখতে পাব সেখানেও এই বিশ্বের বা সৃষ্টির অবতারণা দিয়েই ভগবৎপ্রসঙ্গ শুরু করা হয়েছে। ভাগবতের প্রথম শ্লোক বা ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র আক্ষরিকভাবে অভিন্ন—'জন্মাদ্যস্য যতঃ...।' পূজনীয় গীতানন্দজী তাঁর 'ভাগবতকথা' গ্রন্থে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ''যিনি বাক্যমনের অতীত, সেই ভগবানের স্বরূপ কিভাবে বোঝা যাবে? যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে বিরাজমান, যিনি অনাদি, অনন্ত, যিনি নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকার, তাঁর স্বরূপ কিভাবে প্রকাশিত হবে? এই তো মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন। বেদান্তসূত্রে (ব্রহ্মসূত্রে) এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের দুটি লক্ষণ আছে—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ বাক্যমনের অতীত, সন্দেহ নেই। তটস্থ লক্ষণ হল—যে-আরোপিত ধর্মের দ্বারা বস্তু-জ্ঞান হয়, সেটাই তটস্থ লক্ষণ। যেমন একজন অনেক দূরে একটি উঁচু গাছ দেখিয়ে বলল, 'ঐ দেখ নদী' অর্থাৎ গাছের নিচেই নদী রয়েছে। ঐ যে গাছ, ওটা নদীর তটস্থ—নদীর ধর্ম নয়; কিন্তু ঐ গাছকেই নদীর অসাধারণ ধর্ম (বাহ্য ধর্ম) আরোপ করে নদীকে জ্ঞাপন করা হল। যতক্ষণ সৃষ্টি রয়েছে, ততক্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তারূপ ধর্ম আরোপ করে, সেই আরোপিত ধর্মের দ্বারা আমরা তাঁকে জানতে পারি—অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ জানা না গেলেও, তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।" *(ক্রমশ)*